OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 525 - 534
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনা : একটি পর্যালোচনা

বিংশতি সরকার
সহকারী অধ্যাপক, লালবাবা কলেজ
Email ID: calphinix@gmail.com
0009-0000-3587-3838

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Environment, ethics, environmental pollution, man and environment, Rabindranath and environmental philosophy.

Abstract
Rabindranath Tagore was a 20th-century Indian thinker who discussed many subjects in his writings, including the environment. This essay will focus on the relationship between nature and humanity in Tagore's philosophy and will discuss the ideal role for humans in this relationship. Although he extensively discussed nature in his stories, novels, essays, plays and songs, this essay will primarily limit its discussion to his environmental essays due to space constraints. The discussion will explore the extent to which his views on environmental issues align with those of environmental ethicists, as well as whether the environmental philosophy found in Vedic literature had any influence on him. Furthermore, it will shed light on how Tagore's ideas about the environment can guide us in solving the environmental problems the entire world faces today.

Discussion

ভূমিকা : প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কটা নতুন নয়। নতুন যেটা সেটা হল, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। বহুকাল পর্যন্ত, আমাদের ধারণায়, প্রকৃতি একটা বাইরের বস্তু ছিল। প্রকৃতি যেন যোগানদার, যে শুধুই আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগান দিয়ে যাবে। এই মনভাবে, প্রকৃতিকে একটা Robotic Slave বা যান্ত্রিক ক্রীতদাস বলে মনে হয়। প্রকৃতির যেন কোন সত্ত্বা নেই এবং এখানে মানুষই প্রবলভাবে মুখ্য। এই তামাদি মনভঙ্গি যত প্রশ্রয় পেয়েছে, ততই মানুষের স্বার্থপরতা ও প্রকৃতির প্রতি অবিচার হয়েছে মাত্রাছাড়া। অসংখ্য প্রাণীকে লুপ্ত হতে হয়েছে শুধু মানুষেরই জন্য। যারা এখনো রয়ে গেছে, তারাও কোণঠাসা। এদের মধ্যে অনেকে হয় বিলুপ্তির পথে, নাহলে চিড়িয়াখানায়। অরণ্য ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব কতটুকু ও কতদিন থাকবে, সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। বায়ু, জল, মাটি তিনটিই দূষিত। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিপদসীমা ছাড়িয়েছে আগেই। ওজনস্তরের মত রক্ষাকবচ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি আমরা। বারুদের স্তূপের উপর বসে, প্রতিনিয়ত চকমকি ঠুকে যাচ্ছি।

বিভিন্ন সাহিত্যিক পরিবেশ নিয়ে তাদের সাহিত্যে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে। কেননা, শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্যেই নয়, বাস্তব জগতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মাধ্যমেও তিনি পরিবেশের প্রতি তাঁর ভালবাসার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংক্রান্ত নৈতিক প্রশ্নগুলির বিষয়েও আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দর্শন ও পরিবেশ ভাবনা : দর্শনের এমন একটি শাখা বিদ্যমান যেখানে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় এবং সেই সংক্রান্ত নৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেই বিদ্যাকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা [Environmental Ethics] বলা হয়। পরিবেশের আদৌ কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, নাকি পরিবেশ শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজনে মুল্যবান- এই সংক্রান্ত নৈতিক প্রশ্ন এই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। যে মতবাদে মানুষের স্বার্থকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়, তাঁকে নৃ-কেন্দ্রিক মতবাদ [Anthropocentric view] বলা হয়েছে। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষই নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। পক্ষান্তরে, যে মতবাদে মানুষ ভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তাকে বলা হয় অ নৃ-কেন্দ্রিক মতবাদ [Non-anthropocentric view]। এখানে মনুষ্য ভিন্ন প্রাণী ও প্রকৃতিরও স্বতঃমূল্য [Intrinsic value] স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি আমাদের যে নৈতিক দায়িত্ব তা মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বরং প্রকৃতির নিজস্ব মূল্যের জন্যই।

প্রচলিত নীতিবিদ্যায় বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে, প্রকৃতি বা পরিবেশের কোন স্বতঃমূল্য [Intrinsic value] নেই। প্রকৃতির কেবলমাত্র সহায়ক মূল্য [Instrumental value] রয়েছে। মানুষেরই একমাত্র স্বতঃমূল্য [Intrinsic value] আছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে, জগতে যা কিছু পরিবর্তন, তার একটি উদ্দেশ্য আছে। তিনি প্রকৃতিকে এমন একটি শ্রেণিবিন্যাস হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন যেখানে কম যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের জন্য বিদ্যমান থাকে যাদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা বেশি, যেমন মানুষ। উদ্ভিদ প্রাণীদের জন্য, এবং পশুপাখি মানুষের জন্য গৃহপালিত প্রাণী তার ব্যবহারের এবং খাদ্যের জন্য, বন্য প্রাণী (অথবা যে কোনও ক্ষেত্রে তাদের বেশিরভাগ) খাদ্য এবং জীবনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক, যেমন পোশাক এবং বিভিন্ন সরঞ্জামের জন্য। তিনি এও নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে, প্রকৃতি সমস্ত প্রাণীকে মানুষের জন্যই তৈরি করেছে।[i]

কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, তা যথাযথ নয়। প্রকৃতি নিজের বৃক্ষরাজি-লতা-গুল্মে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। বরং যে কোন প্রাণীকে, এমনকি মানুষকেও বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়।

আর্নে নেস, অলডো লিওপোল্ড প্রভৃতি চিন্তাবিদ প্রকৃতিকে মানুষের এক সমান্তরাল অবস্থানে দেখতে চেয়েছেন। অলডো লিওপোল্ড তাঁর 'Land Ethics' গ্রন্থে বলেন, আমরা যখনই গাছপালা, পশুপাখি, জলের কথা বলি, তখন আমরা সর্বদাই নিজেদের সুবিধার কথা ভেবেই তাঁর প্রশংসা করি। আমাদের উচিত জমির সকল সদস্যের প্রতিই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা। আর্নে নেসও তাঁর 'The shallow and the deep, long range ecology movement: A summary' প্রবন্ধে গভীর বাস্তুতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যে পরিবেশ : বর্তমানে দেখা যাচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে, যার মূল কারণ হল পরিবেশ দূষণ। প্রকৃতির এই চরম সঙ্কটের বিষয়টিকে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও যখন মানুষ অদেখা করে দিচ্ছে, তখন তার দেড়শো বছর আগে থেকেই একজন বুঝে নিয়েছিলেন সেই সমস্যার বিষয়টি – যা মানুষের অস্তিত্বকেও নাড়িয়ে দেবার মত ক্ষমতা রাখে। তাঁর রচনার বহু স্থানেই পরিবেশের প্রতি তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে দার্শনিকতায় মণ্ডিত করে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের মতই প্রকৃতিরও স্বতঃমূল্য আছে। মানুষ প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯ শে চৈত্র, ১৩০২ সালে বসে 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় (চৈতালী কাব্যে), রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, -

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব-
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।"
(ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী,)[ii]

এই পংক্তিগুলি লেখার সময় তিনি যে শুধু কবিতা লিখছেন তা নয়, নগর সভ্যতায় পিষ্ট মানবের নাভিশ্বাসও অনুভব করছেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের এই মহান মনীষী যেন গোটা মানব সভ্যতার নাড়ি টিপে বুঝে নিতে চাইছেন আসল অসুখটা কোথায়। হারিয়ে যাওয়া অরণ্য ফিরে পাবার দাবিতে তিনি যেন মানুষ, প্রকৃতি ও নৈতিকতাকে একসূত্রে জুড়ে দিলেন। এ লেখার আগে ও পরে নানা লেখায় তিনি বারবার বুঝিয়ে যান, প্রকৃতি কোনো নিতান্তই বাহ্যিক বস্তু নয়। রূপে রসে গন্ধে স্পন্দিত এক সজীব সত্ত্বা।

তিনি মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থে রচিত নগর সভ্যতাকে ফিরিয়ে নিয়ে তার পরিবর্তে সেই সময়কে ফিরিয়ে দেবার আকুতি জানাচ্ছেন যখন মানুষ প্রকৃতির সাথে একসঙ্গে বসবাস করত। সেই সুন্দর, প্রাণোজ্জ্বল প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় তাঁর এই আকুতি। তিনি প্রকৃতিকে মাতৃ স্বরূপা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিকট প্রকৃতির সজীবতা এতটাই প্রবল যে, তিনি পঞ্চভূতের দ্বারা সৃষ্ট এই জগতের বন্দনা করেছেন। ক্ষীতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম – এই পঞ্চভূতের দ্বারা জগতের সৃষ্টি। জগতের উৎপত্তিতে এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষীতি অর্থাৎ মাটিকে তিনি মাতার সাথে তুলনা করেছেন। শিশু যেমন মায়ের কাছে কিছু পাবার জন্য আবদার করে, তেমনি মানুষও মাতৃ স্বরূপা মাটির কাছে প্রতিনিয়ত নিজের প্রয়োজনের সামগ্রী কামনা করে চলেছে। তার চাওয়ার সাথে পাওয়ার পার্থক্য হলেই সমস্যার সূত্রপাত। ভূমিলক্ষ্মী প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, -

> "মাতার কাছে ছোটো ছেলে যেমন আবদার করে, মাটির কাছে আমরা তেমনি বারবার আবদার করিয়া আসিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিয়া এই মাটি আমাদের দাবি মিটাইয়া আসিয়াছে। আর যাহাই হউক আমরা কখনো অন্নের অভাব অনুভব করি নাই, কিন্তু আজকাল যেন আমাদের সেই অন্নের অভাব ঘটিয়াছে। মাটি আমাদের এখনকার দিনের সকল আবদার মিটাইতে পারিল না বলিয়া মাটির উপরে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে"। (ঠাকুর, অরণ্যদেবতা প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩৫৮)[iii]

রবীন্দ্র কর্মে পরিবেশ ও প্রকৃতি ভাবনা : প্রকৃতির প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, তা তিনি শুধুমাত্র তাঁর লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, বরং তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়েও তাঁর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপন, শারদোৎসব, পৌষমেলা, বসন্তোৎসবের মত বেশ কিছু উৎসব ও অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানগুলির কেন্দ্রে রয়েছে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেকার আনন্দ যোগ। ১৯২৫ সালে তাঁর জন্মদিনে উত্তরায়ণে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু হয়। এর পর বৃক্ষরোপণ উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয় বর্ষামঙ্গল উৎসব। (সরকার)[iv]

শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন যেন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার গবেষণাগার। মানুষের সাথে সজীব প্রকৃতির এক প্রাণবন্ত সম্পর্কের সন্ধানে, এখানে আমৃত্যু তিনি করে গেছেন নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেটা সেটা হল স্থান নির্বাচন। হাওড়া, হুগলি এমনকি বর্ধমান ছেড়ে আদি বাসস্থান জোড়াসাঁকো থেকে অনেক দূরে বীরভূমের কর্কশ রুক্ষ মালভূমির মধ্যে এমন এক ভূখন্ড বেছে নিলেন, যেখানে সবুজের প্রায় কণামাত্র নেই। সেই স্থানকে ধীরে ধীরে বৃক্ষে, পল্লবে, গুল্মে লতায় সবুজে সবুজ করে গড়ে তুললেন শান্তির আবাস-শান্তিনিকেতন। প্রাকৃতিক পরিবেশে অরণ্যের আভাসে, সজীব প্রকৃতির ছোঁয়ায় শিক্ষার্থীদের উপহার দিলেন এক অনন্য শিক্ষার অঙ্গন।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য এ প্রসঙ্গে, সেটি হল শিক্ষায় প্রকৃতিকে অনবদ্যভাবে সংযুক্ত করা। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার পরিবেশ নির্মাণ করলেন, সেখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতেন খোলা আকাশের নিচে, গাছের ছায়ায় মাটিকে বসে। মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানে নির্মিত এই সজীব ক্লাসরুমে, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার প্রথম পাঠটি দেওয়া হত, শিশুকালেই। এই শিশু যখন বড় হয়, তখন প্রকৃতিকে অশ্রদ্ধা করা তো অনেক দূরের কথা, পরিবেশের প্রতি যেকোনো অবিচারেই তাদের অন্তর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবেশ সচেতন এক মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলার এই অভিনব পরিকল্পনা মানুষের ইতিহাসে বিরল।

প্রকৃতি চিন্তায় বাদ গেল না কৃষি ভাবনাও। তাই কৃষি নিয়ে স্বকীয় মতের প্রতিফলন ঘটালেন শ্রীনিকেতনে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা শেখানোর উদ্দেশ্যে। যে যুগে জজ ব্যারিস্টারি পড়ানোর জন্য ধনীব্যক্তিরা সন্তানদের বিলেত পাঠাতেন, সেযুগে নিজের ছেলেকে চাষাবাদ শেখানোর জন্য বিদেশে পাঠানোর মত সিদ্ধান্ত যে বৈপ্লবিক তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃতিকে তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর হৃদয় দিয়ে, অনুভুতি দিয়ে। তাঁর চিন্তা-চেতনায়-মননে প্রকৃতির গভীর প্রভাব তাঁর কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনায় বৈদিক প্রভাবও লক্ষ্যনীয়। নানা বৈদিক সাহিত্যে যে প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তার উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনার নানা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা : প্রকৃতির যে মানুষের মতই প্রাণ আছে, তা বিভিন্ন শাস্ত্রের মাধ্যমেও আমরা জানতে পারি। স্বল্প কিছু উদাহরণে সেটি স্পষ্ট হবে।

"মহাভারতের শান্তি পর্বে (শান্তি পর্ব ১৭৮/১১-১৫, ১৭) ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগু বলেছেন, গাছেরও প্রাণ আছে। বাতাস বা আগুনের উত্তাপে গাছের ছাল, পাতা, ফুল, শুকিয়ে ম্লান হয়ে যায়। এতে বোঝা যায় গাছ স্পর্শ অনুভব করে। বজ্রনির্ঘোষেও ফুল ও ফল বিদীর্ণ হয়, যা প্রমান করে গাছের শ্রবণশক্তি আছে। তাদের দৃষ্টি শক্তিও আছে... (বন্দ্যোপাধ্যায়)[v]

সৃষ্টির আদি লগ্নে মানুষ ছিল অরণ্যবাসী। বাস্তুতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী মানুষ বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, যন্ত্র প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। ফলস্বরুপ, মানুষ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করল। মানুষের সাথে প্রকৃতির যে মেলবন্ধন, সেখানে বিচ্ছেদ ঘটল।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেই যুগে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ছিল সখ্যতা। মানুষ প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রন করতে শেখেনি তখনো। একে অন্যের সাহচর্যে বেড়ে উঠেছে। (বন্দ্যোপাধ্যায়)[vi] "পশুদের সুস্থতা এবং নিরাময় পরিবার ও পরিজনের মতোই আকাঙ্খিত ছিল সেকালে"। (বন্দ্যোপাধ্যায়)[vii] জল ছিল মানুষের প্রীতিকর বন্ধু। (বন্দ্যোপাধ্যায়)[viii] সামবেদে "বাতাসকে পিতা, ভ্রাতা ও সখা সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'তুমি আমাদের জন্য প্রস্তুত কর আয়ু প্রদানকারী ভেষজ'। জলকেও কল্যাণকারিণী স্নেহময়ী জননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে"। (বন্দ্যোপাধ্যায়)[ix]

কৃষ্ণ যজুর্বেদের [২/৩/২৩] শতপথ ব্রাহ্মণে পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান আছে, যা বিশ্বের মঙ্গলের মধ্যেই যে মানুষের মঙ্গল তার বার্তা বহন করে। পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে অন্যতম ভূতযজ্ঞ। ভূত বলতে এখানে সমস্ত প্রাণীকুলকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ ভূতযজ্ঞ বলতে পশুপাখি, লতাগুল্ম, বৃক্ষ, কীটপতঙ্গ এই সমস্ত জীবের প্রতি দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শন করাকে বোঝায়। (বন্দ্যোপাধ্যায়)[x]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মানুষ এবং জগতের যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, সকলই পরমেশ্বরের থেকে উৎপন্ন এবং আত্মা থেকে অভিন্ন পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদনীয়।[xi] অথর্ববেদের বিভিন্ন স্থানেও মাটির সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে প্রাণীবধ স্বর্গ লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক নয় বলে মাংস বর্জন করার নির্দেশ আছে (৫/৪৮)।[xii]

রবীন্দ্র রচনায় পরিবেশ ভাবনা : বৈদিক সাহিত্যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সখ্যতার বার্তা রবীন্দ্র সাহিত্যে স্পষ্ট। তিনি প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে এই জগতের কল্পনাই করতে পারতেন না। তিনি জগতকে কল্পনা করেছেন প্রকৃতির মাঝে। মানুষ ও প্রকৃতির যে একটি সহজ ও সজীব সম্পর্ক আছে, প্রকৃতি যে শুধুমাত্র বাইরে নেই, আমাদের ভিতরেও যে তার নিত্য প্রকাশ এই ভাবটি অসামান্য ভাবে তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বলাই', 'ছুটি', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি ছোটগল্পে। অরণ্য দেবতা, হলকর্ষণ, পল্লীপ্রকৃতি ইত্যাদি প্রবন্ধে, দুই পাখির মত কবিতায়, রক্ত করবী, মুক্তধারা ইত্যাদি নাটকে, ও নানা পত্রে যেমন, ছিন্ন পত্রাবলী। এরকম বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথের গভীর পরিবেশ ভাবনা ও সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের অসংখ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগের বিষয়টি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রবন্ধে পরিসরের স্বল্পতার কারণে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা সংক্রান্ত আলোচনা মূলতঃ তাঁর রচিত প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকৃতির প্রতি তাঁর সুচিন্তিত ও বাস্তবমুখী ভাবনারই দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন, তপোবন প্রবন্ধে প্রকৃতি ও মানুষের সাহচর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, -

> "ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল"। (ঠাকুর, তপোবন, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড ৬৯০)[xiii]

উপরন্তু প্রকৃতিই যে মানুষের মূল চালিকা শক্তি তাও তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তপোবন প্রবন্ধে তিনি আরও লেখেন, -

> "...প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিসিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি"। (ঠাকুর, তপোবন, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড ৬৯০)[xiv]

অর্থাৎ প্রকৃতি প্রতিনিয়ত মানুষকে তাঁর সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে মানুষ আরও বেশী বলশালী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ক্ষমতালোভী মানুষ সেই ক্ষমতারই অপব্যবহার করে চলেছে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার নিমিত্ত।

প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে একটি উন্নত ও সৃজনশীল সমাজ কখনই গড়ে উঠতে পারে না। সেই বিষয়টিকেই তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধে। মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের মাধ্যমেই যে সভ্যতার পত্তন হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন নদীর উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, নদীই ছিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। উদাহরণ স্বরূপ তিনি নীলনদ, ইয়াংসিকিয়াং, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতার উল্লেখ করেছেন। জীব ও জড় - এদের একে অন্যের প্রতি সাহচর্য ও মেলবন্ধনই যে উভয়ের উন্নতির কারণ, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। সভ্যতার সৃষ্টি এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সাহচর্য ভিন্ন কোনভাবেই সম্ভবপর নয়, তা তাঁর বিভিন্ন লেখা এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বারংবার পরিস্ফুট হয়েছে। তবে প্রকৃতির জয়গান করতে গিয়ে তিনি আধুনিক যন্ত্র সভ্যতাকেও কোনভাবে অস্বীকার করেননি। তাই শ্রীনিকেতনে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বলেছেন।

> "...এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব।
> এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বানী।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ নং খণ্ড পৃ - ৩৬৬)[xv]

শক্তির ব্যবহার শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজনে নয়, সমস্ত জীবজগতের উন্নতিতে ব্যবহার করার ইঙ্গিতই তিনি দিয়েছেন।

বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে, ফলস্বরূপ মানুষ নিজেকে জগতের সর্বময় কর্তারূপে কল্পনা করতে শুরু করেছে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ববোধ, তা বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে গেছে। মানুষ শুধুমাত্র নিয়েই চলেছে, ফিরিয়ে দেবার কথা ভুলেই গিয়েছে। এর মূলে রয়েছে, প্রকৃতির প্রতি মানুষের ঔদাসীন্য। মানুষের এই উদ্ধত আচরণের ফল হল আজকের বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মৃত্তিকা দূষণের মত সমস্যা যা প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করছে। পরিবর্তে মানুষ যদি পরিবেশের সঙ্গে সাহচর্যের কথা বিস্মৃত না হত, তাহলে আজ আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হতাম না।

সভ্যতার প্রথম দিকে খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজনে মানুষ ক্রমাগত নিজের অবস্থানকে স্থানান্তরিত করেছে। তবে এই অস্থায়ী অবস্থা মোটেই কার্যকরী ছিল না। তাই মানুষ বারংবার এর স্থায়ী সমাধান খুঁজেছে। ফলে যখন কৃষিকার্যের সূচনা হল, তখন মানুষ যেন সেই আকাঙ্ক্ষিত সমাধান পেল, তার মধ্যে স্থিরতা এল। প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সাহচর্য মানুষের সভ্যতাকে অনেকখানি এগিয়ে দিল।

রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন তাঁর অরণ্যদেবতা প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, -

> "পলিমাটিতে ভূমিকর্ষণ করে মানুষ যখন একই জায়গায় বৎসরে বৎসরে প্রচুর ফসল ফলিয়ে তুললে তখনি অনেক লোক এক স্থানে স্থায়ীভাবে আবাস পত্তন করতে পারল- তখনি পরস্পরকে বঞ্চিত করার চেয়ে পরস্পরকে আনুকুল্য করায় মানুষ সফলতা দেখতে পেলে"। (ঠাকুর, অরণ্যদেবতা প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩৬৩)[xvi]

সমস্ত জীবজগতকে প্রকৃতি পরম স্নেহে আদরে বরণ করেছে। উদ্ভিদ পূর্ব পৃথিবী ছিল রুক্ষ, প্রাণের অনুপযোগী। প্রকৃতি ধীরে ধীরে লতা-গুল্ম-তরুলতা দিয়ে রুক্ষ পৃথিবীকে করে তুললো প্রাণের উপযোগী। বিপুল প্রাণের আহ্বানের জন্যই এই বিপুলতার আয়োজন। কিন্তু মানুষ সেই অরণ্য ভূমিকেই নিজের লোভের কাছে পরাজিত হয়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সেই ধরণী আজ বিপদের সম্মুখীন। আর তার মূল কারণ হল মানুষের অত্যধিক লোভ এবং লাগামহীন চাহিদা। যার ফলস্বরূপ কলকারখানার বাড়বাড়ন্ত। কারখানার বর্জ্য পদার্থ প্রতিনিয়ত মৃত্তিকা, জল, বায়ুকে দূষিত করছে। উর্বর ভূমি আজ ফসল ফলাবার অনুপযোগী। মানুষ নিজের লোভের বশবর্তী হয়ে, নিজের কল্যাণের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে, যে প্রকৃতি তার অগ্রগতির সহায়ক হত, তাকেই ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। অরণ্যদেবতা প্রবন্ধে তিনি এবিষয়টিই উল্লেখ করে বলেন, -

> "...বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারি দিকে তাঁর তৃণশস্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন করে। তখনো জীবের আগমন হয় নি; তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া।...
>
> মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান প্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ যে হারাল; ...আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। ... সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে - আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।
>
> ... বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন- মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে বৎস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে"। (ঠাকুর, অরণ্যদেবতা প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী,)[xvii]

ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনেও পরিবেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় দর্শনেই মনুষ্যেতর প্রাণীর হত্যা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বরং অন্যের প্রতি করুণা প্রদর্শনের মাধ্যমেই যে মানুষের মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়, তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির ধনী মানুষের অতিরিক্ত ভোগবাদী মানসিকতা পরিবেশ ও নিরীহ প্রাণীদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং মানুষকে সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে অভিভাষণ এ বলেছেন, -

> "মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রাকারে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে ওঠে, তার পর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ করে বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না, আর অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি কতদিন থেকে চলছে তা আমরা জানি না। গাছপালা, জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ্ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন-গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর-একটি জগৎ সৃষ্টি করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান ও প্রদানের যোগ-প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সেই ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। ...মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিকমত চলে, তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘদিন কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড়ো-একটা দেখতে পাই নে তখন বুঝতে পারি দেউলে হতে আর বড়ো বেশি বাকি নেই"। (ঠাকুর, অভিভাষণ, বিশ্বভারতী সম্মিলনী, রবীন্দ্র রচনাবলী ৩৮৫)[xviii]

তাঁর রচনায় প্রকৃতির যে অপরূপ বর্ণনা পাই, তাতে শুধুমাত্র তাঁর প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাকেই বোঝায় না, বরং তিনি যে প্রকৃতিকে কোন অংশেই মানুষের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি, সে বিষয়টি স্পষ্ট। প্রকৃতিকে তিনি চেতন সত্ত্বা রূপেই পূজা করেছেন। মানুষের অস্তিত্বকে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করেই দেখেছেন। জীব ও জড়ের মেলবন্ধনেই সভ্যতার সূত্রপাত। মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই শুধুমাত্র প্রকৃতির গুরুত্ব, একথা তিনি কখনই বলেননি। কিন্তু বর্তমান যুগে মনুষ্য ভিন্ন সমস্ত কিছুরই মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মনুষ্য সমাজের সেই প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই আজ প্রকৃতি নিঃস্ব। পরিবেশ দূষণের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষের অস্তিত্ব আজ সঙ্কটাপন্ন। সেই সঙ্কটমোচনের তাগিদেই মানুষের আজ পরিবেশের প্রতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্র চিন্তার সঙ্গে পরিবেশ নৈতিকতার সাযুজ্য : পাশ্চাত্য পরিবেশ নীতিবিদ আর্নে নেস, প্রচলিত পরিবেশ সংক্রান্ত মতবাদকে অগভীর বাস্তবাদ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, পরিবেশ সংক্রান্ত নেসের মতবাদ গভীর বাস্তবাদ নামে পরিচিত। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রচলিত মতবাদে মানুষকে কেন্দ্র করে পরিবেশের গুরুত্ব আলোচিত হলেও নেস তা সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, পরিবেশ শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজনের স্বার্থেই মুল্যবান – একথা সঠিক নয়, বরং পরিবেশের নিজস্ব মূল্য রয়েছে। অর্থাৎ গাছপালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির স্বতঃমুল্য (Intrinsic Value) রয়েছে। তাঁদের মতে, এই প্রাকৃতিক বৈচিত্রকে হ্রাস করার কোন অধিকার মানুষের নেই। এমনকি গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থকগণ 'জীব' অথবা 'প্রাণ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে জীববিদ্যাবিশারদগণ যাকে 'জড়' বলেন, তার সম্বন্ধেও প্রাণ শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করেন। ফলে তাঁরা 'নদীকে বাঁচতে দাও' বলে দাবি করেন। (চক্রবর্তী ২৩)[xix] এই একই উক্তি শুনতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'Creative Unity' প্রবন্ধে, যেখানে তিনি গঙ্গা নদীর দুর্দশার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসী মনোভাব এবং পরিবেশের সংরক্ষণের প্রতি উদাসীনতাই এর কারণ। তিনি লিখেছেন, -

> "Some years ago, when I set out from Calcutta on my voyage to Japan, the first thing that shocked me, with a sense of personal injury, was the ruthless intrusion of the factories for making gunny-bags on both banks of the Ganges. The blow it gave to me was owing to the precious memory of the days of my boyhood, when the scenery of this river was the only great thing near my birthplace reminding me of the existence of a world which had its direct communication with our innermost spirit.'' (Tagore 115-116)[xx]

বর্তমানে নদীর সঙ্গে মানুষের কোন আত্মিক যোগ সেভাবে অনুভব করা যায় না, যা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুভব করেছিলেন তার শিশু বয়সে। তার পরিবর্তে মানুষ প্রতিনিয়ত নালা-নর্দমা, নদীকে দূষিত করে চলেছে নির্বিচারে। অতিরিক্ত কলকারখানার ধোঁয়া বায়ুকে ক্রমাগত দূষিত করে তুলেছে, যার ফলে হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যান্সার, COPD-র মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে যা মহামারীর আকার ধারণ করে মনুষ্য সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

হোলমস রলসনও প্রচলিত নীতিবিদদের নৃকেন্দ্রিক মতবাদের বিরোধিতা করে বলেন যে, বন্যপ্রাণীরা প্রকৃতি যেমন, সেভাবেই ব্যবহার করলেও মানুষ তা করেনি। মানুষ বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনের আদলে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। যার ফলে নানা প্রাকৃতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। রলসন প্রকৃতির চৌদ্দটি মূল্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার মধ্য দিয়ে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, প্রকৃতির সমুদয় সম্পদের স্বতঃমূল্য রয়েছে। মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি এবং প্রকৃতিই তার অফুরন্ত ভাণ্ডার উজাড় করে প্রতিনিয়ত মানুষের চাহিদা পূরণ করে চলেছে।[xxi]

পাশ্চাত্য পরিবেশ চিন্তাবিদ অল্ডো লিওপোল্ড তাঁর জমিনীতি প্রবন্ধে বলেছেন, জমির নিজেকে পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতাকেই জমির স্বাস্থ্য বলে। জমি সংরক্ষণের মূল লক্ষ্যই হল জমির স্বাস্থ্য বুঝে তাকে রক্ষা করা। জমির প্রতি নৈতিক মনোভাব দেখানোর একমাত্র উপায় হল জমির প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। জমিকে শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেনের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করা থেকে তিনি মানুষকে বিরত থাকতে বলেছেন। এমনকি জমির সকল সদস্যের প্রতিও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণের কথা তিনি বলেছেন। তিনি মনে করেন, নৈতিকতার পরিধিকে এমনভাবে বিস্তৃত করতে হবে যাতে, মাটি, জল, গাছপালা, পশুপাখি সকলেই যেন সেই পরিধির আওতাভুক্ত হয়। (চক্রবর্তী ১৮-১৯)[xxii] জমির সঙ্গে তাই সখ্যতা রেখে পারস্পরিক আদান - প্রদানের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার মধ্য দিয়ে মাটির সঙ্গে মানুষকে তার প্রাণের সখ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে, না হলে ভবিষ্যতে মনুষ্য সমাজকে ধ্বংসের কবল থেকে কোনভাবেই রক্ষা করা যাবে না। সেখানে মানুষ পাবে না পানীয় জল, বিশুদ্ধ অক্সিজেন, গ্রীষ্মের দাবদাহে মানুষের প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত।

রবীন্দ্র ভাবনা থেকে সমাধান সূত্র ও বর্তমান ব্যবহার : সমস্ত প্রকৃতি জগতে মানুষের সভ্যতা ও তার উন্নতি ঈর্ষণীয়ভাবে মানুষকে সব প্রাণী থেকে আলাদা করে দিয়েছে। তবে সভ্যতার গড়ে ওঠা ও তার বিপুল উন্নতি কখনোই সম্ভব হত না, যদি না যথেষ্ট পরিমাণে প্রকৃতির অবদান থাকতো। আসলে সভ্যতার প্রথম পর্বেই মানুষ লক্ষ্য করেছিল যে, প্রকৃতি জগতে আর যাই হোক, কাঁচামালের অভাব নেই। প্রয়োজন শুধুমাত্র এই কাঁচামালকে নিজের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে বিপুল বৈচিত্র্যে আত্ম উন্নতিতে ব্যবহার করা। ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে শুরু করে মাটি-জল-বাতাস প্রকৃতির সব উপাদানকে মানুষ ব্যবহার করে সভ্যতার রথকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অদম্য গতিতে। এখানে মনে রাখতে হবে শুধু প্রকৃতির দান বা শুধুই মানুষের জ্ঞান দিয়ে অগ্রগতি সম্ভব নয়। যখন এই দান ও জ্ঞান একত্রিত হয়েছে, তখনই প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। তাই আজ যদি কোনভাবে প্রকৃতির গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করি, তাহলে সেই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি নেমে আসবে মানব সভ্যতার পতনে। এই পুরো বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ আঁচ করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অরণ্যদেবতা প্রবন্ধে বলেছেন, - "প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েছে— আজও এই দুটোকেই সহযোগীরূপে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চাই। মানুষের জ্ঞান যেখানে কোনো পুরোনো অভ্যস্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদকে ভাণ্ডারজাত করে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা, সে জমা নিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, তাই এক যুগের মূলধন ভেঙে ভেঙে আমরা বহুযুগ ধরে দিন চালাতে পারব না। আজ আমাদের দিন চলছেও না।

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, "তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক; কর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক'।" (ঠাকুর, অরণ্যদেবতা প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী,)[xxiii]

আপাতভাবে আমরা মানুষের দুর্বলতা বা সবলতাকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখি না। কিন্তু মানব চরিত্রের দুর্বলতা কখনোই অবহেলা করার মত কোন বিষয় নয়। দুর্বল চরিত্রের মানুষ দিয়ে কখনোই একটি সবল জাতি কিম্বা সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। দুর্বলতার প্রশ্রয়েই জন্ম নেয় অন্যায় ও অনৈতিকতার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ। দুর্বল চরিত্রের মানুষ কখনোই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না, অনৈতিকতাকে দমন করতে পারে না। অথচ এর পরিনামেই কত কত সভ্যতা যে নষ্ট হয়েছে, তার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। যে দুর্বলতা গড়ে তোলে একটি অনৈতিক সমাজ, পরে সেই দুর্বলতাই বিনাশ করে তার গর্ভস্থ মানব সম্প্রদায়কে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের যে অন্যায় আচরণ ও অসংযত ব্যবহার, তা আসলে আমাদের দুর্বলতারই পরিচয়। এর পরিণাম কখনোই শুভ হতে পারে না। রবীন্দ্র চিন্তাভাবনায় এই ধরনের চিন্তার প্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্ট -

> "আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ। দুর্বলতা অপরাধ। কেননা, তা বহুল পরিমাণে আত্মকৃত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না।" (ঠাকুর, দেশের কাজ, পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ নং খণ্ড , ৩৬৯)[xxiv]

উপসংহার : যে প্রকৃতি থেকে মানুষের উদ্ভব, বিবর্তন ও পুষ্টি তাকেই সে আকাশছোঁয়া লোভে পদদলিত করতে চায়। অথচ পৃথিবী শুধু তো মানুষের নয়। এ বিশ্ব উদ্ভিদের, পাখির, মাছের, পশুর, কীট-পতঙ্গের, এমনকি ব্যাঙেরও। কিন্তু মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও লোভে বারবার নষ্ট হয়েছে জীবজগতের ভারসাম্য। আজ যখন নতুন করে প্রকৃতিকে নিয়ে ভাবার, কিছু করার প্রয়োজন তখন রবীন্দ্রনাথের কথা বারবার মনে হয়। মনে হয় এই সামঞ্জস্যের কথা তো তিনি বহু আগেই বলেছিলেন। শুধু বাকসর্বস্বতা নয়, নিজের চিন্তা ভাবনা ও প্রকৃতির প্রতি গভীর দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করেও দেখিয়েছিলেন।

খাদের ধারে দাঁড়িয়ে, আজও যদি আমরা প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের একটি বিখ্যাত গান আধ্যাত্মিকতার স্থলে, তীব্র বিদ্রূপ বলে মনে হবে, -

> "আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়...।"

Reference:

i. Singer, Peter, Practical Ethics, Cambridge University Press, Second Edition, 1993, P. 267
ii. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৮
iii. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অরণ্যদেবতা প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ নং খণ্ড, পৌষ, ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৫৮
iv. সঞ্জয় কুমার সরকার. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ ভাবনা . Barisal Today, ৪ ঠা মে, ২০২৪. [https://barisaltoday.com]
v. বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তরা, পরিবেশ ও মানুষঃ সেকাল ও একাল, এভেনেল প্রেস, কলকাতা-৭৭, বৈশাখ, ১৯৩০, পৃ. ৫৭
vi. তদেব, পৃ. ২৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 525 - 534
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

vii. তদেব, পৃ. ২৭
viii. তদেব, পৃ. ২৬
ix. তদেব, পৃ. ২৮-২৯
x. তদেব, পৃ. ২৯
xi. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, (সম্পাঃ), উপনিষদ, ১ম খণ্ড, ঈশোপনিষদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৭০০০০৩, সপ্তম সংস্করণ, ৩৮ তম পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ – ১৪২১, পৃ. ৩
xii. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, [অনুদিত], মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৫১
xiii. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তপোবন, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৬৯০
xiv. তদেব, পৃ. ৬৯০
xv. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ নং খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৩৬৬
xvi. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অরণ্যদেবতা প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ নং খণ্ড, পৌষ, ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৬৩
xvii. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অরণ্যদেবতা প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ নং খণ্ড, পৌষ, ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৭২-৩৭৩
xviii. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অভিভাষণ, বিশ্বভারতী সম্মিলনী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ নং খণ্ড, পৌষ, ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৮৫
xix. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানুয়ারী, ২০১৯/এ, কলকাতা, পৃ. ২৩
xx. Rabindranath Tagore. *Creative Unity*. London: Macmillan And Co., Limited, 1922, page. 115-116, [https://ignca.gov.in]
xxi. খালেক, এ. এস, এম আবদুল, প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা, অনন্যা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ৩৩৭-৩৪২
xxii. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানুয়ারী, ২০১৯/এ, কলকাতা, পৃ. ১৮-১৯
xxiii. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধ, পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড. বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ, ১৪০২, পৃ. ৩৬৬
xxiv. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দেশের কাজ, পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ নং খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৩৬৯